Jahangirnagar University Journal of Journalism and Media Studies
Vol 3 • 2017 • ISSN 2409-479X

ইতিহাস সন্ধিক্ষণ: ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের সংবাদপত্রে স্বরূপ অন্বেষা

মো. মিনহাজ উদ্দীন*

[***সার-সংক্ষেপ:*** *১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা আর নভেম্বরে অভ্যুত্থান, পাল্টা-অভ্যুত্থানের সেই সময়টা বেশ ঘটনাবহুল। এই সময় নিয়ে পরস্পর বিরোধী আলোচনা-সমালোচনা আর তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ইতিহাসবিদ বা কলাম লেখকরা নিজেদের মত করে ঐ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা করে আসছেন। আর যেহেতু এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কোন কমিশন গঠিত হয়নি, খালেদ মোশাররফ–হুদা-হায়দারসহ অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা বা সদস্য হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি, তাই আজও ঐ ঘটনাপ্রবাহ খুবই অস্পষ্ট আর পরস্পরবিরোধী। এই গবেষণায় ১৯৭৫ সালের ৪-৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করে ঐ ঘটনাপ্রবাহের চরিত্রগুলো বিশেষ করে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা পত্রিকায় পাতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছেন তা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদল পরিক্রমায় কে, কীভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করেছেন তাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির এই গবেষণায় দেখা গেছে ৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান করলেও খালেদ মোশাররফ অজ্ঞাত কোন কারণে সেই সময় গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নেননি। তাই তাঁর অভ্যুত্থান সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারে ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়েও ছিল বিভ্রান্তি। অন্যদিকে ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রে এসেই গণমাধ্যমগুলোর উপর শক্ত কর্তৃত্ব আরোপ করেন। ঐ দিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বরই দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। জয়গান-গুণগান ও স্বাধীনতা রক্ষার স্লোগানে জিয়া চলে আসেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। অন্যদিকে গণমাধ্যমের কোথাও ছিল না খালেদ*

* মো. মিনহাজ উদ্দীন: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোশাররফসহ অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হত্যার খবর। গণমাধ্যমে একেবারেই আসেনি বন্দিদশা থেকে জিয়াকে মুক্ত করতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের প্রচেষ্টা বা কর্নেল তাহেরের কথা। যদিও ৭ নভেম্বর ঘটনাপ্রবাহে তাহেরের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বিশেষ মোড় পরিবর্তনকারী ভূমিকা ছিল।]

মূল শব্দঃ ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের সংবাদপত্র, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের।

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের নভেম্বর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ধোঁয়াশাপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাসের এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে পরস্পর বিরোধী দাবী আর দোষারোপের শেষ নেই। ৪০ বছর পরও রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মত করে দিনটিকে পালন করে আসছে। কারও কাছে দিনটি বিপ্লবের, কেউ দেখেন সংহতি আবার কারও কাছে দিনটি মুক্তিযোদ্ধা হত্যার শোকাবহ দিন।

এই সময় নিয়ে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম তাঁর '*এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য*' বইয়ে লিখেছেন,

> 'মুজিব হত্যার পর বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ছিলো দ্বিধাগ্রস্ত এবং দেশ প্রতিদিনই অনিশ্চতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। ... এমন পরিস্থিতিতে আর্মিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরী ছিলো। পদাতিক বাহিনীর মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা ব্রিগেডের ১ম, ২য় ও ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারগণ মেজর ফারুক, রশিদ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো এবং আর্মির চেইন অব কমান্ড পুন:স্থাপনের জন্য তৎকালীন ব্রিগেড কামান্ড কর্নেল শাফায়েত জামিলও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তার অধীনস্থ অফিসার ও সৈন্যগণই তাঁর সার্বিক কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে শেখ মুজিব হত্যায় জড়িত ছিলো'(পৃষ্ঠা: ৮২-৮৩)।

প্রকৃতপক্ষে সেই সময় ছিল খুবই জটিল। কেউ কারও উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর বঙ্গভবনে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। যা সে সময়ের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা মানতে পারছিলেন না। এমনই এক প্রেক্ষাপটে জাতির জীবনে আসে তিন নভেম্বর। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক অভ্যুত্থানের সূচনা করেন মোশতাক-ফারুক-রশীদ চক্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই চেষ্টা

সমন্বিত ছিল না। তাতে দেখা যায়নি সুর্নিদিষ্ট পরিকল্পনা। সে সম্পর্কে গোলাম মুর্শিদ তাঁর *'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। এমনকি ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহারের ব্যাপারেও দোটানায় ছিলেন। তিনি যে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন অথবা ক্ষমতা দখল করেছেন, তা জানিয়ে বেতারে তিনি কোন ভাষণ দেননি। তিনি বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট সেই কাজ করবেন। সে জন্য তিন তারিখে তিনি নিজের ক্ষমতাকে জোরদার না করে সারাদিন মোশতাক, ওসমানী, খলিলুর রহমান ও বিদ্রোহী মেজরদের সাথে দিনভর ফোনে দর-কষাকষি করেন। সন্ধ্যার সময় আলোচনার জন্য একটি দলকে পাঠান বঙ্গভবনে। তখনও তিনি বিশ্বাসঘাতক মোশতাককে প্রেসিডেন্ট পদে থাকার অনুরোধ জানান। আর মেজরদের সাথে রফা হয় এই বলে যে, তাদের নিরাপদে ব্যাংকক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে' (পৃষ্ঠা: ২২৮)।

তিন নভেম্বর থেকে সাত নভেম্বর এই সময়টা ছিল খুবই ধোঁয়াশাপূর্ণ। সে সময় দেশে কোন সরকার ছিল না। অন্যদিক খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান ঘটালেন কিন্তু ছিলেন দ্বিধান্বিত। অনেকের বিবেচনায় তার লক্ষ্য ছিল সীমিত। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিষয়েও তিনি ছিলেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর *'রক্তাক্ত নভেম্বর ১৯৭৫'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার সীমিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন? দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপটু একজন দুর্বল চিত্তের জেনারেল হিসেবে খালেদ যখন চিহ্নিত হতে চলেছেন, তখন আমাদের কানে আসে শাফায়েত জামিলের নাম। আমরা শুনতে পাই শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনে গিয়ে খুনী মোশতাককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন জেনারেল ওসমানী সামনে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে মোশতাককে রক্ষা করেন- এমন কথা শোনা যাচ্ছিলো' (পৃষ্ঠা: ২৩)।

অন্যদিকে সক্রিয় ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জাসদের সৈনিক সংস্থা তখন বেশ সংঘঠিত। ৭ নভেম্বর দলটি তাদের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহবন্দি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। সংঘঠিত হয় পাল্টা এক অভ্যুত্থান। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান একেবারেই অস্বাভাবিক রকমের রক্তপাতহীন থাকলেও এই পাল্টা অভ্যুত্থান আর রক্তপাতহীন থাকেনি। এতে যেমন জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার হাতে ক্যান্টনমেন্টে অফিসাররা নিহত হন। ঠিক তেমনি

প্রাণ হারান খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও মেজর হায়দারের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধারাও। খালেদ মোশাররফের ক্যু ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা দিয়ে কর্নেল শাফায়াত জামিল তাঁর *'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর'* বইয়ে লিখেছেন,

> 'আগেই বলেছি ৬ নভেম্বর রাতে খালেদ চলে যাওয়ার পর আমি বঙ্গভবনে রয়ে যাই খালেদের নির্দেশে। খালেদের সাথে আর যোগাযোগ হয়নি আমার। তারপরতো সিপাহী বিপ্লব ঘটে গেল। রাত তিনটার দিকে জিয়া ফোন করলেন। আমাকে বললেন 'Forgive and forget, lets unite the army' আমি তখন রূঢ়ভাবেই বলি আপনি সৈনিকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না' (পৃষ্ঠা: ১৪৫)।

যদিও শাফায়াতের এই হুঁশিয়ারি সত্য হয়নি। জেনারেল জিয়াউর রহমানই পরবর্তীতে বাংলাদেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। চার বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেন রাষ্ট্রপতির। যার শুরু হয়েছিল এক অস্থির পরিস্থিতির মাধ্যমে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান রক্তপাতহীন থাকলেও ৭ নভেম্বর থেকেই শুরু হয় রক্তপাত। যা অব্যাহত থাকে দীর্ঘদিন। খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৭ নভেম্বর যে পাল্টা ক্যু সংঘঠিত হয় তার নেপথ্যে ছিল নানামুখী গুজব, মিথ্যা তথ্য আর অপপ্রচার। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল খালেদ মোশাররফকে ভারতের চর হিসেবে চিত্রিত করা। যে কাজটি বেশ সাফল্যের সাথে করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর *'জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি'* বইয়ে বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন,

> '৩ নভেম্বর থেকে সেনানিবাসগুলোতে খালেদকে ভারতের দালাল হিসেবে যারা প্রচার করছিলো তাঁরা ছিলেন জিয়ার পক্ষের লোক। তাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিলো কর্নেল তাহেরের। সব জায়গাতেই রটে যায়, ভারতের মদদে খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। ... ৫ নভেম্বর রাতে গুলশানে আনোয়ারা সিদ্দিকের বাসায় সৈনিক সংস্থার কয়েকজন নেতাকে একটি ছাপানো প্রচারপত্র দেয়া হয়। জাসদ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নামে সেনানিবাসগুলোতে এই প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং ভারতের দালাল ও বিশ্বাসঘাতক খালেদ মোশাররফ চক্রকে উৎখাত করার আহ্বান জানানো হয়' (পৃষ্ঠা: ১৯০)।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলদের এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে। যেগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। যা নিয়ে পুরোপুরি গবেষণালব্ধ ফল বের করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। তবে এই গবেষণার অন্য কারণগুলোর খালেদের চরিত্র চিত্রণের প্রতি আলোকপাত করা। এই অভ্যুত্থান ও

সহযোগীসহ খালেদের নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেহেতু কোন কমিশন হয়নি, কোন বিচার হয়নি তাই এ বিষয়গুলোর ধোঁয়াশা আজও কাটেনি। ৭৫ এর নভেম্বর ঘটনাপ্রবাহে কার ভূমিকা কি ছিল তা আজও পরিষ্কার হয়নি। এমনকি এই ঘটনা নিয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা বা গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহ করাও বেশ কষ্টসাধ্য। এই গবেষণায় সেই সময়ের পত্র-পত্রিকার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

পটভূমি

'ইতিহাস সন্ধিক্ষণ: ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের সংবাদপত্রে স্বরূপ অন্বেষা' শিরোনামের এই গবেষণায় ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলতে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর ঘটনা প্রবাহকে বুঝানো হয়েছে। আর সংবাদপত্র হিসেবে চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আর স্বরূপ অন্বেষা বলতে মূলত সেই সময়ের প্রধান চরিত্রগুলো (খালেদ-জিয়া-তাহের) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রধান চরিত্রগুলো কীভাবে সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে সেই সেই বিষয়টি। ঐ ঘটনা প্রবাহে কে কোন রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোতে কোন দর্শনের আলোকে কী ভূমিকা রেখেছিলেন সেটা এই গবেষণার বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে মূল বিবেচ্য কীভাবে তাদেরকে সেই সময়ের সংবাদপত্রে চিত্রিত করা হয়েছে সেই বিষয়টি।

ইতিহাস সন্ধিক্ষণ

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলতে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের এক সপ্তাহকে বুঝানো হয়েছে। এই সময়টা চার নভেম্বর থেকে শুরু করে নয় নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই বাংলাদেশে এক ধরনের অস্থিরতা চলছিল। কে রাষ্ট্র চালাচ্ছে, কে রাষ্ট্রের বৈধ প্রতিনিধি, কোথায় কার মাধ্যমে কী ঘটছে তা নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা (হুদা, নিলুফার: ২০১৫)। এমনই অরাজকতা আর অস্থিরতার মধ্যে আসে নভেম্বর ১৯৭৫। ১৫ আগস্টের পর থেকে ক্যান্টনমেন্টে না ফিরে খুনী মেজর চক্র মোশতাককে সামনে রেখে যেভাবে দেশ চালাচ্ছিলো তা মানতে পারেনি সেনাবাহিনীর এক অংশ। তারা চাচ্ছিলেন ফারুক-রশীদরা ক্যান্টমেন্টে ফিরে আসুক। সেনাবাহিনীতে ফিরুক চেইন-অব-কমান্ড। যাই হোক এমন বাস্তবতায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ মোশতাক ও খুনী মেজর চক্রের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান করেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তাঁর সাথে ছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল, কর্নেল হুদা ও মেজর হায়দার। এই অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কর্নেল শাফায়াত জামিল তাঁর *'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর'* বইয়ে লিখেছেন,

> '৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো: ক. সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুন:প্রতিষ্ঠা করা। খ. ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকান্ডের

> সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা। গ. সংবিধান বহির্ভূত অবৈধ সরকারের অপসারণ এবং ঘ. একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর' (পৃষ্ঠা ১২৬)।

যদিও এর উল্টো ব্যাখ্যা বা যুক্তিও পাওয়া যায়। তিন নভেম্বর খালেদের যে অভ্যুত্থান তা ব্যর্থ হয় ৭ নভেম্বর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের পাল্টা অভ্যুত্থানে। যাতে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে মূল ভূমিকা রাখে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। সে সময় জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। তিনি তাঁর *'মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'খুনী শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সেনা প্রধান জিয়াকে বন্দি করা এবং পত্রিকায় এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব ও অ্যাডমিরাল এম এইচ খান কর্তৃক তাঁকে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পড়ানোর দৃশ্য দেখে অনেকেই ভাবলেন, খালেদ সেনাপ্রধান হওয়ার জন্যেই বুঝিবা এই অভ্যুত্থান ঘটালেন। ... খালেদ মোশাররফ চাচ্ছিলেন মুশতাককে ক্ষমতায় রেখেই শান্তিপূর্ণভাবে জিয়াকে সরিয়ে নিজে সেনাপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হতে। এ নিয়েই ফারুক-রশীদ-ওসমানী-মুশতাক চক্রের সাথে দেন-দরবারে সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলো। খালেদ জিয়াসহ এসব নায়কদের উচ্চাভিলাষ ছিলো প্রবল' (পৃষ্ঠা ৮৫)।

তিন থেকে সাত নভেম্বরের এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিতর্ক এখনও কাটেনি। মীমাংসা হয়নি অনেক বিষয়ের। যাই হোক এই গবেষণায় মূলত ইতিাসের সন্ধিক্ষণ বলতে এই সময় অর্থাৎ ৪-৯ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে।

সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হয় নানা ঘটনাপ্রবহ। যা ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন গবেষণা উপাদান (হুমায়ূন,আহমেদ: ১৯৯১)। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচও বটে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম বর্তমান সময়ের মত ছিল না। অনেকের মতে সে সময় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত ছিল। রেডিও-টেলিভিশন যথারীতি ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। ১৯৭৩ সালে *স্বদেশ* ও *হক কথা* সহ তিনটি পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। চীনা ভাবধারার সাপ্তাহিক *হক কথা* প্রকাশিত হত টাঙ্গাইল থেকে। পত্রিকাটি মাওলানা ভাষানীর মুখপত্র ছিল। তবে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অযথা ভারত বিদ্বেষ ও মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশের অভিযোগ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের শৃঙ্খলা, অনেকের ভাষায় নিয়ন্ত্রণ আনতে ৭৪ সালের ২০ নভেম্বর প্রেস কাউন্সিল আইন পাশ হয়। (বাংলাদেশ গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা, সংকলন:

১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫৭)। এরপর ১৯৭২ সালে পাশ হয় 'বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪'। যার তিনটি ধারা ছিল গণমাধ্যম কেন্দ্রিক। যে ধারা বলে ১৯৭৫ এর ১৬ জুন সরকারী আদেশে সবগুলো পত্রিকা বন্ধ করে চালু রাখা হয় শুধু চারটি দৈনিক পত্রিকা। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, *হলিডে* সহ বেশ কিছু সাপ্তাহিক চালু ছিল। তবে সেগুলো ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীন। এদিকে এই আইন কার্যকরের আগেই বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের মুখপাত্র *গণকণ্ঠ*। অপপ্রচার উস্কানি আর অতি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অভিযোগ ছিল পত্রিকাটির বিরুদ্ধে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

যে কোন গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাটি করতে গিয়েও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের পত্র পত্রিকার সংবাদ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বই, জার্নাল বা কলাম সম্পর্কে বেশ খোঁজ খবর করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ সংক্রান্ত বই খুব বেশি নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কলাম পাওয়া যায়। আর বিভিন্ন লেখক যখন ১৯৭৫ সালের নভেম্বর ঘটনাপ্রবাহ যখন লিখেছেন তখন বিচ্ছিন্নভাবে ঐ সময়ের পত্র পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন।

আব্দুর রহমান আজাদের লেখা *'শেখ মুজিবের হত্যাকারী কে'(১৯৮৭)* এই শিরোনামের বইয়ে ১৯৭৫ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে একটি কলাম পাওয়া যায়। দৈনিক দেশ পত্রিকায় ১৯৮৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রকাশিত *'সাতই নভেম্বরের অঙ্গিকার'* শিরোনামের উপ সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> '....এই দিন জাতীয় জীবনে সংযোজিত হয়েছে আর একটি স্বর্ণ উজ্জ্বল অধ্যায়। জোয়ান-জনতার এক অবিস্মরণীয় ঐক্যবদ্ধ দু:সাহসিক অভিযানের ফলে পঁচাত্তর সালের এই দিনে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মুখচেনা শত্রুদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নবতর তাৎপর্যে তার ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। ..... কিছু দেশ প্রেমিক জওয়ান-জনতার হৃদয়ের গভীরে যে স্বাধীনতার বাণী স্থায়ি অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে তাকে মুছে ফেলার সাধ্য কারও নেই। সাতই নভেম্বরের তাৎপর্য এখানেই। এদিন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সিপাহীরা অভূতপূর্ব দূরদৃষ্টি ও সাংগাঠনিক দৃঢ়তা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো এবং হর্ষোৎফুল্ল জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরাশ্রিত শক্তির সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে সক্ষম হল' (পৃষ্ঠা: ১৪২, ১৪৪-৪৫)।

নভেম্বরের এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎস (Lawrence Lifschultz)। নভেম্বরের এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তিনি ১৯৭৭ সালের

আগস্ট মাসে মুম্বাইয়ের Economic and Political Weekly পত্রিকাতে *Abu Taher's Last Testament: Bangladesh: The Unfinished Revolution* এই শিরোনামে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি লেখেন,

> `In the first 'prong' Major-General Zia was to be rescued from detention, and if at all possible, Brigadier Khaled Musharraf and his associates were to be captured alive. The 'second prong' of the mutiny was to be set in motion at the same time. Demonstrations and processions supporting the insurrection were to be organised for the morning of November 7, and the 'Twelve Demands' of the soldiers were to be made the fundamental issue once Khaled's group had been defeated. Zia's rescue would serve as a symbol of the uprising, while the demands of the sepoys would constitute the principled basis of the revolt. It was this second aspect, in addition to the ssupport of thousands of people who poured into the streets of Dacca (Dhaka) to cheer the rebel soldiers, which distinguished the mutiny from the narrow conspiracies of August 15 and November 3.` (Lifschultz, Lawrence : 1977).

লিফশুলৎস এর ভাষ্য অনুযায়ী ৭ নভেম্বর যে বিপ্লব বা ৩ নভেম্বরের প্রতি চেষ্টা শুরু হয় তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা। সাথে ছিল খালেদ মোশাররফ ও অন্যান্যকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করা। এছাড়া সৈনিকদের নানাবিধ দাবি সম্বলিত ১২ দফা আদায় করাও ছিল ৭ নভেম্বর বিপ্লব বা প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া ঢাকার রাস্তায় সিপাহী ও জনতার সম্মিলিত সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের। অথচ এই ঘটনাপ্রবাহের যে চিত্র গণমাধ্যমে বিশেষ করে মুদ্রণ মাধ্যমে উঠে এসেছে তাতে কোথাও কর্নেল তাহের বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের কোন ধরনের তৎপরতার কথা উল্লেখ ছিল না। কর্নেল তাহেরের নাম কোথাও উল্লেখিত হয়নি। এছাড়া এই নিবন্ধে লিফশুলৎস ৭ নভেম্বর ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আরও বিস্তারিত লিখেছেন..

> The euphoria of November 7 was not to last. T'he rebels believed – from everything they knew of his personal history - that although Zia might not support the revolutionary dimension of the uprising, he would not actively oppose the establishment of soldiers' committees. On the evening of the 7th Zia signed the 'Twelve Demands' and committed himself to their implementation. Whether it was a ruse or momentary conviction remains an open question. But the backing the rebels gave Zia proved to be their crucial error. They did not expect that Zia would himself become the rallyting point of the rightist forces. Lenin had remarked that there could not be a socialist revolution

> in a country unless half the country's army had become revolultionaries first. While the uprising and its aftermnath certainly brought many more into their ranks, the Bangladesh Army on November 7 had clearly not reached the class-conscious stage which Lenin considered the essential condition. Perhaps only Shakespeare or Thucydides could do justice to the painful drama of betrayal, courage, and death which followed the mutiny. Two men- Zia and Taher - who once called each other brothers, would bitterly break that bond over an issue which in essence coutld be said to divide the entire underdeveloped world. What would it be - revolutionary socialism in one of the poorest of the world's nations, or a path of capitalist development based on the largesse of the Americans and the plans of the World Bank? On the 7th and 8th of November the mutiny pressed ahead in the country's other military cantonments. Serious confrontations occurred between officers and soldiers. In Dacca and Rangpur forty officers were believed to have been killed by their men. Officers and their families fled the cantonment areas. On the 9th of November a senior military official claimed that less than 35 percent of the officer cadre remained in control of their commands. The rest had fled. A few of those killed were identified with Khaled Musharraf's November 3 coup but others died as a result of confrontations between officers and soldiers who were pressing their Twelve Demands. While many officers had supported the 'first prong' of the uprising which rescued Zia, they fiercely resisted other demands. Numerous officers at this stage attempted to 'resume command' of their troops and ordered them back to barracks. Several units in turn told their commanders that officers were no longer in command. Enlisted men were reported to have ripped badges of rank off officers' lapels. Commanders in various brigades and battalions were told they must agree to the demand for the establishment of revolutionary committees in each unit as the new organ of authority. (Lifschultz, Lawrence:1977).

লিফশুলৎসের এই বর্ণনার কোন কিছুই প্রতিফলিত হয়নি বাংলাদেশের পরের কয়েকদিনের গণমাধ্যমে। ৭ নভেম্বর পর্যন্ত খালেদ মোশাররফের চেষ্টা বা অভ্যুত্থান সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে অনেক রাখ-ঢাক রেখে আবার ৭ নভেম্বর থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে এসেছেন জেনারেল জিয়ারউর রহমান। যেখানে ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিশাল প্রকাশ।

সংবাদপত্র পর্যালোচনাভিত্তিক এ বিষয়ে আর তেমন কোন সাহিত্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র পর্যালোচনা সংক্রান্ত

বিভিন্ন বই পাওয়া যায় যেগুলোর বেশির ভাগরই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদপত্র পর্যালোচনা অথবা ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড বিষয়ক। যেমন: আহমদ রফিকের 'একাত্তরের বর্বরতার সংবাদ ভাষ্য' (২০১০) সময় প্রকাশন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সংবাদপত্রে প্রতিফলন (মার্চ ২০০৮), বাংলাদেশ প্রেস ইন্সস্টিটিউট। এছাড়া 'নিরীক্ষা' নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালের ৮৩ তম সংখ্যাতেও 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণমাধ্যম' নিয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ ছাপা হয়। যেগুলোতে ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ৩ থেকে ৭ তারিখের ঘটনাপ্রবাহ এখনও অনেকটাই রহস্য আবৃত। এই ঘটনা নিয়ে কোন কমিশন গঠিত হয়নি, তেমনি হয়নি কোন বিচার। তবে কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় সামরিক ট্রাইব্যুনালে কর্নেল তাহেরর ফাঁসির সাজা হয়। যা কার্যকর হয় ২১ জুলাই। ঐ ফাঁসির দীর্ঘ দিন পর ২০১০ সালে ঐ সামরিক আদালতের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পৃথক রিট করেন কর্নেল তাহেরের স্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন। পর ২০১১ সালে হাইকোর্ট বেঞ্চ ঐ গোপন বিচারকে অবৈধ ঘোষণা করে কর্নেল তাহেরের ফাঁসিকে ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেন। এতটুকু ছাড়া নভেম্বরের ঐ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অনেকের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। এই গবেষণায় ইতিহাসের ঐ অন্ধকার অংশে আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে থেকে খুব বেশি কিছু না পাওয়া সম্ভাবনা থাকলেও সেই সময়ের পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের। তবে একটা বিষয় উল্লেখ্য পত্রিকার চরিত্র চিত্রণে কারও প্রকৃত প্রতিমূর্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ ৭ নভেম্বরের পর পত্র-পত্রিকাগুলো ছিল সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত। যাতে অসত্য, অর্ধসত্য, অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যা ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করে সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে সরাসরি বা দৃঢ় কোন সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যার জন্য দরকার আরও বিস্তর গবেষণা। দরকার রাষ্ট্রীয় আইনী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম।

গবেষণা পদ্ধতি

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সাম্প্রতিককালের। শুরুর দিকে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় এই পদ্ধতিটি শুধুই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের গণসংযোগ ধারা, প্রক্রিয়া এবং এর প্রভাব জানার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর। তবে মানুষের অন্যান্য আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণেও এই পদ্ধতি

বেশ কার্যকর। গণযোগাযোগকারী যার এবং যাদের সাথে যোগাযোগ করছেন, যে বিষয়ে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে তার প্রক্রিয়া এবং প্রভাবের উপর যে ধরণের গবেষণা হয় তাকেই এক কথায় আধেয় বিশ্লেষণ বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ বলে। বিভিন্ন সামাজিক রচনা বা শিল্প যেমন: বই, সঙ্গীত, ভাষ্য, চিত্রকলা ইত্যাদি সতর্কভাবে নির্দিষ্ট উপায়ে অধ্যয়ন করে সামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহের পদ্ধতিকে আধেয় বিশ্লেষণ বলে উল্লেখ করেছেন ই.আর. বেইবি। মানুষের সাথে সারাসরি যোগাযোগ ছাড়াই এই পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যময় সামাজিক বিষয় বা নিয়ামক পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে।

আধেয় বিশ্লেষণ নিয়ে অনেক গবেষকই সংজ্ঞা বা মতামত তুলে ধরেছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাদের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ও বিক্ষিপ্ত। O.R. Holstu আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেন, 'Content analysis is a procesure for applying scientific method to documentary evidence'. অপর এক সংজ্ঞায় Bernard Berelson আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেন, 'Content analysis is any research technique for the objective, systematic and quantative description of the manifest content of communication.' (রহমান, ২০০৬)।

নমুনায়ন

নমুনা হিসেবে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের সংবাদপত্র বলতে চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে বুঝানো হয়েছে। পত্রিকাগুলো হলো: ১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২. দৈনিক বাংলা, ৩. দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ৪. দ্যা বাংলাদেশ টাইমস্, ৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা: এই সংবাদপত্রগুলোর চার থেকে নয় নভেম্বর পর্যন্ত এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রার ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত পত্রিকার নমুনাকে গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. দৈনিক ইত্তেফাক: ইত্তেফাক বাংলাদেশে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক ছিল। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইত্তেফাকের বিশেষত্ব হচ্ছে পত্রিকাটি সাধু ভাষায় প্রকাশিত হত। এখনও পত্রিকাটির সম্পাদকীয় সাধু ভাষায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তাসমীমা হোসেন। ইত্তেফাক পত্রিকার প্রাণপুরুষ বলা হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার হাত ধরেই মূলত এই পত্রিকার বিকাশ। ১৯৬৯ সালের ১ জুন তিনি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে ভগ্ন স্বাস্থ্যজনিত জটিলতায় মৃত্যুবরণ করেন।

২. দৈনিক বাংলা: প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এই পত্রিকার নাম ছিল দৈনিক পাকিস্তান। পাকিস্তান আমলে এই পত্রিকা ছিল পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন। স্বাধীনতার

পর পত্রিকাটির নাম হয় দৈনিক বাংলা। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি। তিনি সরকার মনোনীত সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

৩. দ্য বাংলাদেশ অবজারভার: বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় নাম ছিল পাকিস্তান অবজারভার। প্রকাশক ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা, প্রাদেশিক পরিষদের তৎকালীন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরি। ১৯৫৪ সালে পত্রিকাটি দ্য পাকিস্তান অবজারভার নামে প্রকাশিত হতে থাকে। স্বাধীনতার পর পত্রিকাটি ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় তখন এর নাম ছিল দ্য অবজারভার।

৪. দ্য বাংলাদেশ টাইমস্: ১৯৭৫ সালে দ্য বাংলাদেশ অবজারভারের মত দ্য বাংলাদেশ টাইমস্ও ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা। বলা যায় সরকারী পত্রিকা। সরকারের অধীনেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। সে সময় অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এনায়েত উল্লাহ খান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক এনায়েত উল্লাহ খানকে এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন (লিফশুলৎস, লরেন্স: ২০১৬)।

৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা: বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় একটি সাপ্তাহিক। ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার সহযোগী হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। দ্রুতই পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এতে সে সময় সরকারের বিভিন্ন নীতি বিরোধী গঠনমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হত। থাকতো মতামত ও বিশ্লেষণ। ১৯৭২ সালে চালু হয়ে ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল।

স্বরূপ অন্বেষা

স্বরূপ অন্বেষা বলতে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ঐ ঘটনাপ্রবাহে কাকে, কিভাবে দেখানো হয়েছে তা তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে। কাকে বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ ঘটনাপ্রবাহের মূল তিনটি চরিত্রকে। ক. জেনারেল জিয়াউর রহমান, খ. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং গ. কর্নেল (অব.) আবু তাহের'কে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান করলেও গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নেননি খালেদ মোশাররফ। তাই সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। তবে ৭ নভেম্বর পরিস্থিতিতি পরিবর্তিত হয়। ঐ দিন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংবাদ প্রকাশে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা ঐ দিনেই বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। যাতে এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। স্বরূপ অন্বেষা বলতে সেই সময়ের উল্লেখিত চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণকে বুঝানো হয়েছে। আরও আধেয়

মূলত জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল (অব.) আবু তাহের কেন্দ্রিক।

জেনারেল জিয়াউর রহমানঃ মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর কমান্ডার, বীর উত্তম। সাবেক রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর তিনি চট্টগ্রামের কালুরঘাটের বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান নিযুক্ত করা হয়। পরে তিনি ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসেই সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনি চট্টগ্রামে একদল সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যের হাতে নিহত হন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফঃ মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর কমান্ডার, বীর উত্তম। ১৯৭১ সালের গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে বিশেষ এক নাম। গেরিলা যোদ্ধাদের গুরু। ১৯৭৫ সালে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যতম জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। তখন তাঁর পদবী ছিল ব্রিগেডিয়ার। অনেকেই মনে করেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর তিনি খুনি মেজরদের আর্মি চেইন অব কমান্ডে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এর ক্যু'র পর নিজেকে সেনাপ্রধান হিসেবে উন্নীত করেন। খালেদ মোশাররফ ৭ নভেম্বর সকালে শেরে বাংলা নগরে নিহত হন। কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে তা আজও পরিষ্কার নয়।

কর্নেল (অব.) আবু তাহেরঃ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, সেনা কর্মকর্তা। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে অ্যাবোটাবাদ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের কারণে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বর আবু তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সহযোগিতায় এক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের রাজনৈতিক উইং *বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা* এর প্রধান। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে জাসদের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর এক বিচারে তাঁর ফাঁসির দণ্ড হয়। যা কার্যকর করা হয় ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই। ২০১১ সালের ২২ মার্চ তাহেরর বিচারকে 'অবৈধ ও তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে বলে রায় দেয় হাইকোর্ট বেঞ্চ'।

গবেষণা প্রশ্নঃ

এই গবেষণার প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

১. ৪ থেকে ৯ নভেম্বর (১৯৭৫) পর্যন্ত সময়ে চারটি দৈনিক পত্রিকা ও একটি সাপ্তাহিকে সেনাবাহিনীতে ক্যু ও পাল্টা ক্যু এর খবর কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

২. জেনারেল জিয়াকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে?

৩. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে কিভাবে চিত্রিত করেছে?

৪. কর্নেল (অব.) আবু তাহের এবং জাসদ কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

সীমাবদ্ধতাঃ

- এই গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের পত্র পত্রিকা খুব একটা সহজলভ্য নয়। অনেক সন্ধানের পর বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের পত্র পত্রিকার সন্ধান পাই।
- গবেষণার জন্য নির্ধারিত পত্রিকার পাতা কয়েক জায়গায় ছেঁড়া ছিল। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকের ৮ ও ৯ নভেম্বরের সংখ্যায় পত্রিকা পাতার ডান পাশের এক অংশগুলো পাওয়া যায়নি।
- এই সংক্রান্ত রেফারেন্স বই নেই বললেই চলে। ১৯৭১ সালে পত্র পত্রিকার ভূমিকা, ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের সময় পত্র পত্রিকার প্রতিফলন নিয়ে রেফারেন্স পাওয়া গেলেও নভেম্বর ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কোন রেফারেন্স বই নেই বললেই চলে। তাই প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়তে হয়েছে।

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

এক. ৩ ও ৪ নভেম্বরের সংবাদপত্রঃ আড়ালে খালেদের অভ্যুত্থান খবর ও চারদিকে ধোঁয়াশা-বিভ্রান্তিঃ

১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর গভীর রাতে (দিনের হিসেবে ৩ নভেম্বরের শুরু) খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াতদের অভ্যুত্থান শুরু হয়। কিন্তু তারা ক্ষমতা সুসংহত করেননি। নিয়ন্ত্রণ নেননি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের। পত্র-পত্রিকাও ছিল অনেকটা স্বাধীন। তাই ৩ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে মোশতাক-ফারুক চক্রের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান সংঘঠিত হলেও পত্র পত্রিকায় কোন রকম প্রতিফলন দেখা যায়নি। তাই ৩ নভেম্বর *ইত্তেফাকের* প্রধান শিরোনাম 'উদার শস্য ক্রয় নীতি ঘোষণা', *দৈনিক বাংলায়* প্রধান শিরোনাম হিসেবে লেখা হয় 'ধানের মন ৭৪ টাকা: চাল ১২০ টাকা', *দ্য বাংলাদেশ অবজারভারের* শিরোনাম 'Procurement not compulsary' *দৈনিক দ্য বাংলাদেশ টাইমস্* এর শিরোনাম ছিল 'Govment will bye paddy, rice at heigher rate'.

উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় গণমাধ্যম ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা ছিল না। তিনি গণমাধ্যমকে গুরুত্বের সাথে নেননি। যা অনেক গবেষকের জবানীতেও উঠে এসেছে। এ বিষয়ে লে.কর্নেল (অব.) এম.এ.হামিদ (পি.এস.পি.) তাঁর *'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও না বলা কিছু কথা'* গ্রন্থে

লিখেছেন... 'সকাল থেকেই সারা দেশে আবার বিভ্রান্তি। রেডিও ধরতে গিয়েই বিপত্তি। কোন শব্দ নেই। রেডিও বন্ধ। সবাই ধরে নিয়েছে আবার ক্ষমতার হাত বদল হয়ে গেছে। যদিও মোশতাক তখনও প্রেসিডেন্ট। শাফায়াত জামিল সাভারে অবস্থিত রেডিও ট্রান্সমিটারের একটি অংশ খুলে নেওয়ায় রেডিও ব্রডকাস্টিং সম্পূর্ণ বন্ধ। দেশের মানুষ আরও একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ল'। লে.কর্নেল. (অব.)এম.এ.হামিদের এই পর্যবেক্ষণ অনেকটা যৌক্তিক বলে মনে করা যেতে পারে। যদি খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগিরা এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতেন তা হলে হয়ত অবশ্যই সকালের পত্র পত্রিকা অর্থাৎ ৩ নভেম্বরের পত্র পত্রিকার আধেয় অন্যরকম হতে পারতো। এই ধারা অব্যাহত থাকে পরের সময়গুলোতেও।

৪ নভেম্বরেও *ইত্তেফাকে* এ সংক্রান্ত কোন খবর আসেনি। যদিও এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ৩ নভেম্বর রাতেই কারাগারের অভ্যন্তরে ঘাতকের গুলিতে নিহত হয়েছেন জাতীয় চার নেতা। সেনানিবাস আর বঙ্গভবনে চলছে উত্তেজনা। এমন প্রেক্ষিতে ৪ নভেম্বরেও *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রধান শিরোনাম ছাপে 'সাহারা পরিস্থিতি সংকটজনক' এই শিরোনামের সংবাদ। যাতে লেখা হয় .. 'সাহারা পরিস্থিতি সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্প্যানিশ সাহারাকে স্বাধীনতা দানের প্রশ্নে আগ্রহী দেশগুলোর দৃঢ় ও সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের একদিন পর মাদ্রিদের পরিবর্তে মরক্কোর দিকে এখন সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে' (ইত্তেফাক, ৪ নভেম্বর ১৯৭৫)।

দুই. ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রঃ পরোক্ষ অভ্যুত্থান খবর, ক্ষমতার কেন্দ্রে খালেদ, শেখ মুজিবের জন্য শোক মিছিল :

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফদের অভ্যুত্থানের খবর প্রথম আসে ৫ নভেম্বরের পত্রিকায়। সেটাও পরোক্ষভাবে। সেদিনও সরাসরি কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। দৃষ্টি দেয়া যাক *দৈনিক ইত্তেফাকের* দিকে ৫ নভেম্বরের *ইত্তেফাকের* এ সংক্রান্ত খবরগুলো ছিল ... 'ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দীন নিহত', 'সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে মে.জে. খালেদ মোশাররফ', 'মে.জে. জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ', 'বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন', 'চারজন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ গৃহীত, দুই জন আটক', 'হরতাল না করার আহ্বান', 'শহরে মৌন মিছিল'। 'ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দীন নিহত' এই শিরোনামের খবরটিতে বলা হয়, 'সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী জনাব এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান গত রবিবার মধ্যরাতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিহত হয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ... রজিউন। গতকাল মঙ্গলবার জেল সূত্র হতে এই তথ্য পাওয়া গিয়াছে। তাদের লাশ গতরাতে সেন্ট্রাল জেলে বিশেষ ব্যবস্থায় ময়নাতদন্ত করা

হয়। ইহার পর গতরাত পৌনে দুটার দিকে তাহার আত্মীয় স্বজনদের বুঝাইয়া দেয়া হয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহীরা তাহাদের বাসায় সমবেত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৫ আগস্টে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার পর তাদের ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে আটক রাখা হয়'। এখানে লক্ষ্যণীয় কে তাদের হত্যা করলো, কেন হত্যা করলো সে সংক্রান্ত কোন তথ্য ছিল না। সাংবাদিকতায় প্রধান মূল নীতি অনুযায়ী কি এবং কেন ঘটেছে তা সন্ধান করা একজন সাংবাদিকের কর্তব্য কিন্তু সে বিষয়ে কোন তথ্য এখানে ছিল না। হয়ত এমন বিষয়গুলো নিরীক্ষা করার সময় বা সুযোগ কোনটিই তখন ছিল না।

অনুরূপভাবে 'সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে মে.জে. খালেদ মোশাররফ' সংক্ষিপ্ত এই সংবাদে বলা হয়, '.. মঙ্গলবারর প্রেসিডেন্টের বিশেষ এক ঘোষণায় বলা হয় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম পিএসসি কে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পূর্বাহ্ন হইতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া চীফ অব আর্মি স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। একই দিনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম পিএসসি পদত্যাগ করায় তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।' এখানেই শেষ। এরপর কিন্তু এতো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আর কিছু ছাপা হয়নি। অর্থাৎ বলা যায় সেই সময়েও খালেদ মোশাররফ ও তাদের সহযোগি অভ্যুত্থানকারীরা কোন অবস্থাতেই গণমাধ্যম বা পত্র পত্রিকাকে ব্যবহার করতে চাননি। ফলে পত্র পত্রিকাগুলো এক সংকটকালীন সময়ে অনেকটা দায়সারা গোছের সংবাদ পরিবেশন করে গেছে।

তবে এদিনের অর্থাৎ ০৫ নভেম্বরের অন্য একটি খবর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। *ইত্তেফাক* অন্যান্য খবরের সাথে ছাপে 'শহরে মৌন মিছিল' শিরোনামের খবরটি। উল্লেখ্য জাতীয় ছাত্রলীগের আয়োজনে ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর বাড়ি পর্যন্ত একটি শোক মিছিলের আয়োজন ছিল। এটা ছিল ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম কোন শোক মিছিল। এ খবর নিয়ে অন্য তিনটি পত্রিকা শিরোনাম করে, 'ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধু রুহের মাগফেরাত কামনা' 'Homage paid to Bangabandhu' 'Homage to mujib'. এই খবরগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহত হওয়ার পর আবার সংবাদপত্রের পাতায় আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। উল্লেখ্য এই শোক মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই। তাই সে সময় বিভিন্ন অঙ্গনে রটে যায় যে খালেদ মোশাররফ ভারতের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত করতে এই অভ্যুত্থান করেছেন। যদিও খালেদ মোশাররফ বা তাঁর সহযোগি অভ্যুত্থানকারীরা তখন সেই প্রচার বা অপপ্রচার রুখতে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেননি।

দৈনিক বাংলা'তে প্রকাশিত ৫ নভেম্বরের সংবাদের শিরোনাম ছিল '*ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধু রুহের মাগফেরাত কামনা*'। যার বর্ণনায় বলা হয়,

> '... মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ছাত্রদের একটি মৌন মিছিল বের করা হয় এবং ১১ টা ১৫ মিনিটে মিছিলকারীরা ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বার সড়কে উপস্থিত হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মিছিলটির পুরোভাগে বঙ্গবন্ধুর বিশাল একটি প্রতিকৃতি ছিলো। ... বত্রিশ নম্বর বাসভবনে পৌছে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গেটে বঙ্গবন্ধবুর শেখ রহমানের শেখ চারটি প্রতিকৃতি লাগিয়ে দেন এবং এর উপর পুষ্পমাল্য ও ফুল ছিটিয়ে দেন। তারা বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। পরে মিছিলটি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ফিরে এসে শেষ হয়। বিকেলে শহীদ মিনারে এক ছাত্র জমায়েত হয়। জমায়েত শেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পুরান হাইকোর্ট ও প্রেসক্লাব হয়ে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়' (দৈনিক বাংলা, ৫ নভেম্বর, ৭৫)।

তিন. ৬ নভেম্বরের সংবাদপত্রঃ মোশতাকের বদলে সায়েম প্রেসিডেন্ট, খালেদের সেনা প্রধানঃ ৬ নভেম্বরের দৈনিক পত্রিকায় খালেদ মোশাররফদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট খবর প্রকাশিত হয়নি। এদিক *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রধান শিরোনাম ছিল 'বিচারপতি সায়েম নয়া প্রেসিডেন্ট', *দৈনিক বাংলা* ছাপে 'মোশতাকের পদত্যাগ' এই শিরোনামের খবর। আর ইংরেজি দৈনিক *দ্য বাংলাদেশ অবজারভারের* শিরোনাম ছিল 'Justice Sayem replaces Mostaque' *দ্য বাংলাদেশ টাইমস্* প্রধান শিরোনাম হিসেবে ছাপে এই খবরটি 'Mostaque hands presidency to sayem'. এই খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই সংবাদগুলো খুবই সাদামাটা পর্যায়ের । অর্থাৎ ঘোষণা শ্রেণীর। খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করলেও শুধু সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার খবর ছাড়া আর কোন সংবাদ নেই। নেই কোন সুদৃঢ় ঘোষণা। নিজের অবস্থান সুসংহত করতে খালেদ মোশাররফ কি ইচছাকৃতভাবেই সে সময় গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেননি না কি তিনি চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা কিন্তু গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছিল অনেকটা জোরালোভাবে, বলা যায় যথাযথভাবে। আর এদিন দৈনিক *বাংলাদেশ টাইমস্* এ প্রকাশিত একটি ছবি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ঐ দিন প্রত্রিকাটির খালেদ মোশাররফের কাঁধে বিমানবাহিনী প্রধান ও নৌ বাহিনী প্রধান পদোন্নতির ব্যাজ খালেদ মোশাররফকে পড়াচ্ছেন এমন ছবি প্রকাশ করে। যে ছবির নানা ধরনের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

চার. ৭ নভেম্বরের সংবাদপত্রঃ গণমাধ্যম আধেয়র ব্যাপক পরিবর্তন, ঘটনাপ্রবাহের তাজা বিবরণ প্রকাশে টেলিগ্রাম ও বিশেষ সংখ্যাঃ

খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াতদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয় ৭ নভেম্বর মধ্যরাতে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের গণবাহিনী এই পাল্টা ক্যু'এর সূচনা করে। জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা হয়। পাল্টে যায় পুরো ঘটনা প্রবাহ। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান খবর পত্র-পত্রিকায় সেভাবে প্রকাশিত না হলেও জাসদের এই পাল্টা ক্যু ও জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসার খবর প্রকাশিত হয় অস্বাভাবিক গুরুত্ব সহকারে। ৭ নভেম্বর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সিপাহী-জনতার বিপ্লব শিরোনামে প্রচুর খবর ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রকাশ করে *বিশেষ সংখ্যা* ও *দৈনিক বাংলা* প্রকাশ করে *টেলিগ্রাম*। ঐ সময় সংবাদপত্রগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল নাকি চাপে পড়ে করেছিল তা আলাদা গবেষণার দাবী রাখে।

৭ নভেম্বর সকালে যে পত্রিকা নগরবাসীর হাতে যায় তাতে ছিল জেনারেল জিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসার ঘটনা প্রবাহ। *দৈনিক ইত্তেফাকের* শিরোনামগুলো ছিল 'প্রেসিডেন্ট সায়েম প্রধান সামরিক প্রশাসক জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান', 'প্রিয় দেশবাসী ...', 'প্রাণ বন্যায় উচ্ছল নগরী', 'মসজিদে মসজিদে মোনাজাত', 'নিজ নিজ কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করুন', 'জেনারেল জিয়ার পদত্যাগের নির্দেশ বাতিল', 'শাহ মোয়াজ্জেম ও তাহের উদ্দীন ঠাকুরের মুক্তি লাভ', 'ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য আইন'। *দৈনিক বাংলায়* প্রকাশিত শিরোনামগুলো ছিল 'জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লব', 'রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রধান সামরিক শাসনকর্তা', 'আনন্দে উদ্বেল মানুষের ঢল নেমেছিলো।' *দৈনিক বাংলার* মূল প্রতিবেদন 'জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লব' যাতে বলা হয় ''.. সিপাহী জনতার মিলিত বিপ্লবে চার দিনের দু:স্বপ্নের প্রহর শেষ হয়েছে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাময়িকভাবে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান সামরিক প্রশাসক ও সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে সেনাবহিনী বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সিপাহী জওয়ানরা বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায়। শুক্রবার ভোরে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক সুস্থ আছেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে চারটায় রেডিও বাংলাদেশে ঘোষিত হয় ষড়যন্ত্রের নাগপাশ থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করেছে বিপ্লবী সিপাহীরা। এর কিছুক্ষণ পর জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ... ... শুরু অনেক আগে থেকেই বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুটো-আড়াইটা থেকে। ঢাকার জনগণ যখন বুঝতে পারলো দু:স্বপ্নের প্রহর শেষ হয়ে আসছে ... শুরু হয়েছে সিপাহী বিপ্লব''(দৈনিক বাংলা,৭ নভেম্বর ১৯৭৫।)

পাঁচ. ৮ নভেম্বরের সাংবাদপত্রঃ সব খবর জেনারেল জিয়া কেন্দ্রিক, খালেদ ষড়যন্ত্রকারী, কোথাও নেই তাহের :

৮ নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহেও নতুন সূচনার জয়গান। ঐ দিন *দৈনিক ইত্তেফাক* ছাপে 'নয়া প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ', 'রব জলিলসহ পাঁচ জনকে মুক্তির নির্দেশ', 'সংশয় ও দুস্বপ্ন অতিক্রম করিয়া' এই শিরোনামের খবরগুলো। আর *দ্য বাংলাদেশ অবজারভারের* শিরোনামগুলো ছিল 'President sayem becames CMLA', 'Mostaqes louds peoples role', 'Perform duty as usual: Zia', 'Curfew in dacca N'gonj', 'City clebrate victory, Jawans hailed', 'Sayem pays tribute to mostaque', 'Mostaque leaves Bangabhaban', '27 participant of jubilation injured', 'Communication Normal' এ দিনও দেখা যায় ক্ষমতা সংহত বা পরিবর্তনের পক্ষে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা। ছিল রাস্তায় জওয়ান আর জনতার সম্মিলিত হর্ষ আনন্দের ছবি। যদিও ঘটনাপ্রবাহে থাকার কথা কর্নেল তাহেরের কথা। আসার কথা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা বা সামগ্রিকভাবে জাসদের কথা। অন্যদিকে ৭ নভেম্বর নিহত হয়েছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। যাদের মৃত্যুর খবর ছিল না পত্র-পত্রিকার কোথাও। আর বিশেষভাবে উল্লেখ্য এসব খবরে বিজয়ের কথা বলা হলেও কার বিরুদ্ধে বিজয়? কিসের বিজয় তা ছিল অস্পষ্ট। যেমন; 'সংশয় ও দুস্বপ্ন অতিক্রম করিয়া' এই শিরোনামে *ইত্তেফাকের* খবরে বলা হয় '.. সকল সংশয় দ্বিধা আর আচ্ছন্নতার মেঘ অতিক্রম করিয়া গত শুক্রবার বাঙ্গালী জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব বিজয় সূচিত হইয়াছে। এই বিজয়ে স্বর্ণোজ্জল দলিলে জনতার প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে লেখা হইলো বাংলার বীর সেনানীর নাম। আর দলিলের শিরোনামে শোভা পাইলো একটি নাম – জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম পিএসসি– একটি প্রিয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। .... কিন্তু বাংলার দেশপ্রেমিক সিপাহীরা গত শুক্রবার প্রভাতে সকল চক্রান্তের অবসান ঘটাইয়া তাহাদের প্রিয় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেন এবং তাহাকে স্বীয় পদে বহাল করেন। এই খবরের বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায়, অনেক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ ধারার তথ্যকে। প্রতিবেদনগুলোতে বারবার বীরত্ব গাঁথার বর্ণনা। কিন্তু কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কার ষড়যন্ত্র কারা মুক্তি দাতা সে সম্পর্কে কোন তথ্যই নেই। শুধুই বীরত্বের জয়গান।

৮ নভেম্বরের আরেকটি খবর বেশ উল্লেখযোগ্য। *দ্য বাংলাদেশ টাইমস্* এদিন ছাপে বিশেষ এক নিবন্ধ (কমেনটারি)। 'Bangladesh Wins Freedom' শিরোনামের ঐ কমেনটারি লেখেন পত্রিকাটির সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান। এই লেখার বেশ কিছু লাইন খুবই কৌতুহল উদ্দীপক। এনায়েত উল্লাহ খান লিখেছেন `Bangladesh thus stand liberated as of this day after a long drawn out struggle that was sparked off by the historic call of General Ziaur Rahman on the morrow of March 25, 1971' যার অনুবাদ দাঁড়ায় অনেকটা এ রকম, দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন থেকেছে এখনও স্বাধীন রয়েছে। যে স্বাধীনতার

ঘোষণা জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। এখানে একটি তথ্যগত বড় ভুল রয়েছে। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চে কোন ঘোষণা দেননি। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৭ মার্চ। এরপর সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন (মুরশিদ, গোলাম: ২০১০)। এই কলামে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে পুতুল সরকার ও বিদেশী প্রভূদের দ্বারা পরিচালিত সরকার হিসেবে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে এনায়েত উল্লাহ খান লিখেছেন। 'The seething cauldron of popular anger and frustration found its first expression on August 15, 1975 when the house of puppet was blown to smithereens by a tiny section of patriotic armed forces.' দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি অংশের দ্বারা পুতুল সরকার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায় ১৫ আগস্ট, জনতার ক্ষোভ আর রাগে স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই দিন। ঐ কলামের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের খুনীরা ছিলেন দেশ প্রেমিক। গুণগান গাওয়া হয় খন্দকার মোশতাকেরও। এনায়েত উল্লাহ খান আরও লিখেছেন,

> 'By the enemy of the people and external power combine were waiting in the wings to strike. The unleashed their paid agent to create confusion among the students and took advantage of the ambition of some unpatriotic army leaders on the plea of restoration of chain of command. And they struck, however briefly, in their bid undo the change and succeeded for a while to create a smokescreen.'

১৫ আগস্টের পর জনতার শত্রু ও বিদেশী শক্তি অপেক্ষায় ছিল আঘাত হানার। তারা তাদের এজেন্টদের ব্যবহার করে নতুন করে ধূম্রজাল তৈরি করতে। একইসাথে কিছু সুযোগ সন্ধানী সেনা কর্মকর্তাও এর সুযোগ নেন। যাদের অজুহাত ছিল সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনা। এখানে উল্লেখ্য, সরাসরি নাম না নেয়া হলেও unpatriotic army leaders বলতে খালেদ মোশাররফকে বুঝানো হয়েছে। একইসাথে এনায়েত উল্লাহ খানের ভাষায় সুযোগ সন্ধানীও ছিলেন খালেদ মোশাররফ। শুধু তাই নয় ঐ কলামের শেষের দিকে তিনি লিখেছেন 'We have chosen two heroes at the moment Khandaker Mostaque Ahmed and General Zia' আমরা দু'জন নায়ককে বাছাই করেছি একজন খন্দকার মোশতাক অপর জন জিয়াউর রহামন। সহজেই অনুমান করা যায়, কতোটা গুনগানে ভরপুর ছিল ঐ সময়ে প্রকাশিত এনায়েত উল্লাহ খানের এই কমেন্টারি।

৯ নভেম্বরের পত্র-পত্রিকায় একই ধারা অব্যহত ছিল। কোথাও নেই খালেদ মোশাররফ আর তাহের। শুধুই জেনারেল জিয়ার জয়ধ্বনি। আর বীরত্ব গাঁথার খবর।

৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক শাসন কর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এ দিন দৈনিক বাংলার শিরোনামগুলো ছিল 'প্রধান সমরিক শাসনকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ', 'ছয় ঘন্টার জন্য কার্ফ্যু বলবত', 'রব-জলিলসহ পাঁচজনের মুক্তির নির্দেশ'। সবই ইতিবাচক। কোথাও কোন প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ নেই। সবই চলছিল অর্জিত বিপ্লবের সোনালী সিড়িঁতে! যাতে নায়ক ভাবমূর্তি নির্মিত হচ্ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের, আর কোথাও নেই নভেম্বর ঘটনা প্রবাহের প্রধান দুই চরিত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আর কর্নেল (অব.) আবু তাহের।

ছয়. ১৪ নভেম্বর, সাপ্তাহিক বিচিত্রা: সব খবর জেনারেল জিয়া কেন্দ্রিক, খালেদ ষড়যন্ত্রকারী কোথাও নেই তাহের:

সেই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*। সরকার নিয়ন্ত্রিত এই পত্রিকায় ৭ নভেম্বর ঘটনা প্রবাহের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪, নভেম্বর ১৯৭৫, ৮২তম সংখ্যায়। যার কাভার শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশ: ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫'। এছাড়া ৭ নভেম্বর ঘটনাপ্রবাহের প্রচুর ছবি সম্বলিত সংবাদের মধ্যে শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত সংবাদগুলো ছিল 'আমি জিয়া বলছি', 'বাংলাদেশ: ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫'। যেগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই ছিল জেনারেল জিয়ার জয়গান। তিনি কিভাবে মুক্ত হলেন । তাতে জাসদের কি ভূমিকা ছিল, অন্যদিক খালেদ মোশাররফের বিপ্লব চেষ্টা, তাদের করুণ মৃত্যু কোন কিছুই স্থান পায়নি সাপ্তাহিক বিচিত্রার পাতায়।

৪ থেকে ৯ নভেম্বর ১৯৭৫। এই সময়ের চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ধরনের বিপরীতধর্মী এক চিত্র পাওয়া যায়। খালেদ নভেম্বর ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান করলেও গণমাধ্যমে বিষয়টি ব্ল্যাক আউটের পর্যায়ে ছিল। ৩ ও ৪ নভেম্বর এ সংক্রান্ত কোন খবরই পত্র-পত্রিকায় আসেনি। যদিও এরইমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ৩ নভেম্বর শুরুতে অর্থাৎ রাত ৩টার দিকে খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল অভ্যুত্থান করেছেন। যার একটু পরেই জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যা করা হয়েছে। খুনী মেজর চক্র দেশ ত্যাগ করেছে। খালেদ মোশাররফ সেনা প্রধান হয়েছেন (মুরশিদ, গোলাম : ২০১০)। জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করেছেন আরও অনেক কিছু। কিন্তু এ সব ঘটনার কথা সময়মতো গণমাধ্যমে আসেনি। ৫ নভেম্বর পত্র-পত্রিকায় আসে জাতীয় ৪ নেতা হত্যার ঘটনা ও এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের কথা। এরপর পত্র পত্রিকা মারফত মোশতাকের পদত্যাগ ও সায়েমের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা জানা যায়। তবে পুরো ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে দেশবাসী প্রায় অন্ধকারে ছিলেন। কারণ খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াতরা গণমাধ্যমকে সে রকম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ব্যবহার করেননি

(হামিদ: ২০০৩) । আর যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা নিখাঁদ তথ্য নির্ভর। সেখানে কোন অতিরঞ্জণ ছিল না। কারও অযাচিত গুণগান ছিল না। এমনকি খুনী চক্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করলেও সেই খবরটিও পত্র-পত্রিকায় আসেনি। এ ব্যাপারে খালেদ ও শাফায়াতরা কোন পদক্ষেপ নেন নি। বিষয়টি খুবই রহস্যজনক। দেশে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের খুনীদের উৎখাত করা হয়েছে, সেই প্রচার বা প্রকাশেও অভ্যুত্থানকারীদের দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধা কেন এবং কি কারণে তা আলাদাভাবে গবেষণার দাবী রাখে।

অন্যদিকে ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়ার ক্ষমতায় কেন্দ্রে এসে পাল্টে যায় পুরো পরিস্থিতি। জেনারেল জিয়া ক্যান্টনমেন্টসহ সারাদেশে যেমন ক্ষমতা সুসংহত করেছেন ঠিক তেমনি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন নিজের মত করে। উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বরের মত ৭ নভেম্বরের পাল্টা ক্যু শুরু হয়েছিল মধ্যরাতের পর। সেক্ষেত্রে খালেদ চাইলে পুরো ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেননি। অন্যদিকে জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার পরই ৭ নভেম্বর সকালে পুরো ঘটনা জানতে পারে দেশবাসী। রেডিওতে ঘোষণা দেওয়া হয়, সকালের পত্রিকাতেও আসে নানা খবর। অন্যদিকে ঐ দিনই বিকেলে দৈনিক ইত্তেফাক ছাপে *'টেলিগ্রাম'* আর দৈনিক বাংলা *'বিশেষ সংখ্যা'*। আর সাথে ছাপা হয় প্রচুর পরিমাণে ছবি। যাতে জিয়ার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সবাই অবগত হন। আনন্দে উৎসবে দেশে মাতোয়ারা এমন খবর প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৭ নভেম্বর থেকে গণমাধ্যমের হিরো ছিলেন জেনারেল জিয়া। তাঁর জয়গান, গুণগানে ভরপুর পত্রিকার পাতা। তবে এ ঘটনাপ্রবাহে কোথাও ছিলেন না কর্নেল (অব.) তাহের ও খালেদ মোশাররফ। খালেদের মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে ছিল না। আর জিয়াকে মুক্ত করতে বড় ভূমিকা রাখেলেও কোথাও কোন শব্দ ব্যবহার হয়নি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ বা কর্নেল (অব.) তাহেরর জন্য। এক কথায় বলা যায় নভেম্বরের ৩ থেকে ৭ উত্থান পতনের এই সময়ে জেনরেল জিয়া গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে, অনেকটা কার্যকরভাবে। আর খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সময় গণমাধ্যমের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। আর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঐ সময়ে চারটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার আধেয়ভিত্তিক নায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান, খলনায়ক খালেদ মোশাররফ। তবে ঘটনাপ্রবাহের অন্যতম অনুঘটক হলেও কোথাও স্থান পাননি জাসদের কর্নেল (অব.) আবু তাহের।

উপসংহার:

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর খুবই ঘটনাবহুল। অভ্যুত্থান, পাল্টা-অভ্যুত্থান, হত্যা আর মিউজিক্যাল চেয়ারের মত ক্ষমতার পালাবদল এই অধ্যায়টিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। এ সংক্রান্ত গবেষণা বা কোন ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে

আসা খুবই জটিল কাজ। নিশ্চিতভাইে এই ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক আছে। সংবাদ মাধ্যমের আধেয়ের ভিত্তিতে যে ফলাফল এই গবেষণায় পাওয়া গেছে তাতে সহজেই বলা যায়, ঐ সময় খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করলেও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেননি। অথচ ৭ নভেম্বর ক্ষমতার কেন্দ্রে এসেই জিয়াউর রহমান গণমাধ্যমকে বেশ কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন। যার প্রতিফলন ৭ নভেম্বর প্রকাশিত '*টেলিগ্রাম* ও *বিশেষ সংখ্যা*'তের বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। আর রহস্যজনক কোন কারণে সংবাদ মাধ্যমে কোন আলোচনাতে ছিলেন না কর্নেল তাহের। যদিও তাহের ছিলেন ঐ ঘটনাপ্রবাহের অন্যতম কেন্দ্রিয় চরিত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার আধেয় এই গবেষণায় শুধু পত্র-পত্রিকার বিশ্লেষণ থেকে ঐ সময়ের প্রতিফলন দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা রাখছি আগামীতে কোন অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে আগ্রহী হবেন। যাতে উন্মোচিত হতে পারে এই ঘটনাপ্রবাহের নতুন কোন অধ্যায়।

তথ্যসূত্র

আজাদ, রহিম (১৯৮৭)। *শেখ মুজিবের হত্যাকারী কে?* ঢাকা: অনীক প্রকাশন।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪)। *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। ঢাকা: প্রথমা।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৮)। *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*। ঢাকা: প্রথমা।

আনোয়ার, হোসেন (২০১২)। *মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আনোয়ার, আলম। (২০১৩)। *রক্ষী বাহিনীর সত্য-মিথ্যা*। ঢাকা : প্রথমা।

ইসলাম, জহিরুল। (২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তাঁর বিয়োগান্তক বিদায়*। ঢাকা: প্রথমা।

গুণ, নির্মলেন্দু। (১৯৯৭)। *রক্ত ঝরা নভেম্বর ১৯৭৫*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

চৌধুরি, মইনুল হোসেন। (২০০০)। *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

জামিল, শাফায়াত (১৯৯৮)।একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

লিফশুৎলস, লরেন্স (২০১৬, পঞ্চম মুদ্রণ)। *অসমাপ্ত বিপ্লব*। অনুবাদ: মুনীর হোসেন। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

মুরশিদ, গোলাম। (২০১০)। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মিয়া, ওয়াজেদ। (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

হক, গাজী নাসের, ১৯৯৬। *বাংলাদেশ গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*। ঢাকা: ইউপিএল, (সংকলন)।

হল, স্টুয়ার্ট (১৯৯৭)। *রেপ্রেজেন্টেশন: কালচারাল রেপ্রেজেন্টেশনস এন্ড সিগনিফাইং প্র্যাকটিসেস*। লন্ডন, নিউ দিল্লী: সেজ প্রকাশনী।

হামিদ, এম.এ. (২০০৩)। *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*। ঢাকা: শিখা প্রকাশনী।

হুদা, নিলুফার (২০১১)। *কর্নেল হুদা ও আমার যুদ্ধ*। ঢাকা: প্রথমা।

হোসেন, আনোয়ার (২০১২)। *মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের।* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হোসেন, সাখাওয়াত (১৯৯৭)। *বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায়: ১৯৭৫-৮১*। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স।

রহমান, আতীকুর (২০০৬)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেন্স।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ। (১৯৯১)। *সাংবাদিকতা*। ঢাকা: বাংলা একডেমি।

দৈনিক ইত্তেফাক (৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নভেম্বর ১৯৭৫)।

দৈনিক বাংলা (৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নভেম্বর ১৯৭৫)।

দ্যা বাংলাদেশ টাইমস্ (৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নভেম্বর ১৯৭৫)।

দ্যা বাংলাদেশ অবজারভার (৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নভেম্বর ১৯৭৫)।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা (১৪, নভেম্বর ১৯৭৫, ৮২ তম সংখ্যা)।

http://archive.thedailystar.net/2006/07/24/d607240901105.htm (Retrieved on 05.05.2018) `*The trial of Colonel Abu Taher*`.

https://www.jstor.org/stable/i399232 (Retrieved on 05.05.2018), *Economic and Political Weekly*, Vol. 12, No. 33/34, Special Number (Aug.1977.)